UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ

DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

Discover natural fibres 2009

এপ্রিল ২০০৯ April 2009

২১তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা Volume-XXI, No. IV

মানবাধিকার হিসেবে নারীর অধিকার

পাল্টা সংস্কৃতি হিসেবে মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া

মানবাধিকার হলো সেসব অধিকার যা মানুষ হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে দাবি করা হয়। অবশ্য বেশিরভাগ মানুষের মানবাধিকার বিশ্বের সর্বত্র অব্যাহতভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সব সভ্যতাই পিতৃতান্ত্রিক বলে কোনো সমাজে সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি যেমনই বিদ্যমান থাকুক না কেন, পুরুষের চেয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার বেশি হচ্ছে নারী। নারী তাদের সমাজে সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে কম ক্ষমতার অধিকারী অংশ। শিক্ষা, চাকরির প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, অবসরের সময়, আয়, সম্পত্তি, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি দফতর, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা এবং তাদের নিজের শরীর ও জীবনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগদান অস্বীকার করা হয়। প্রগতিশীল ও অর্গলমুক্তির সহায়ক বলে বিবেচিত সবকিছুসহ সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, আইন ও দর্শন সচরাচর নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক।

নারীকে বর্জন

প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কিত প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক জেনোর মতবাদ অনুসারে কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে নারীকে আওতাভুক্ত করা হয়নি। খ্রিষ্টান গির্জার নেতা সেন্ট থমাস একুইনাস (সি. ১২২৫-১২৭৪) বহুলাংশে মুসলিম দার্শনিক আভিসেন্না (৯৮০-১০৩৭) ও আভেরোসের (ইবনে রুশদ ১১২৬-১১৯৮) লেখনীর মাধ্যমে প্রাচীন গ্রিক দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন। উভয় মুসলিম দার্শনিক প্রাচীন গ্রিক দর্শন অধ্যয়ন করেন। তাঁরা বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সাম্য ও ধর্মীয় সহনশীলতার জয়গান গেয়েছেন। খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতা তাঁর শিক্ষায় প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু তিনি আভেরোসের সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করেন যাতে লিঙ্গভেদে অসম আচরণের বিরোধিতা করা হয়েছে এবং নারীর মূল্য সন্তান ধারণ ও লালনপালনে নামিয়ে আনাকে সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিপন্থী এবং তাকে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আভেরোসের বক্তব্য ধর্তব্যের মধ্যে না এনে এরিস্টটলের নারীকে 'অবৈধ পুরুষ' হিসেবে নারীবিদ্বেষী তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, সৃষ্টির গোড়ায় ঈশ্বর কেন একটি ত্রুটিপূর্ণ সৃষ্টি নারী সৃজন করবেন। আর অন্যান্য গির্জা নেতা পরে প্রশ্ন করেছেন যে নারীর আত্মা আছে কিনা, অর্থাৎ তারা পুরোপুরি মানব কিনা।

আধুনিককালে জিন-জেকুইস রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) মতো প্রগতিশীল দার্শনিকরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার তুলে ধরতে পারলেও লিঙ্গাভিত্তিক সমতার ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের বিপ-বী চেতনায় নিপীড়নের বিরোধিতা করা হয় যা পুরুষ ও নাগরিকদের অধিকার সংক্রান্ত ফরাসি ঘোষণার পথ সুগম করে (১৭৮৯)। অবশ্য এই দলিলে মানবাধিকারের উচ্চারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সারা বিশ্বের মানুষকে অনুপ্রাণিত করা অব্যাহত রাখলেও তা সে সময়ে বিদ্যমান নারী-পুরুষের বৈষম্য থেকে মুক্ত হতে পারেনি এবং তাতে নারী থাকে বর্জনের শিকার হয়ে। এ সত্ত্বেও ফরাসি নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক ওলিমপি ডি গজেস (১৭৪৮-১৭৯৩) ও ইংরেজ দার্শনিক ওলসটনেক্রাফটের (১৭৫৯-১৭৯৭) গুটিকয় অভিজাত মহিলা তাদের আপত্তি তুলে ধরেন এবং যথাক্রমে নারী অধিকার ঘোষণা (১৭৯০) এবং নারী অধিকারের যথার্থতা প্রতিপাদন (১৭৯১) প্রকাশের মাধ্যমে নারীর অধিকারের পক্ষাবলম্বন করেন। হ্যারিয়ার টেলর মিল (১৮০৭-১৮৫৮) ও তাঁর স্বামী জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) পারস্পরিক সহযোগিতায় যে রচনা সৃষ্টি করেন তাতে নারীর অধিকার ও রাজনৈতিক সমতার পক্ষে বলা হয়েছে।

তবু সমগ্র বিংশ শতকে লিঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান থাকে। এমনকি যে কমিশন ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন তার সদস্যরাও অধিকারগুলোর ধারণাংশে প্রাসঙ্গিক সূত্রে 'পুরুষ' শব্দটি বসাতে চেয়েছিলেন। তখন সোভিয়েত প্রতিনিধি ভ-াদিমির কোরেটস্কি 'সকল পুরুষ' শব্দগুলোর ব্যবহার 'ঐতিহাসিক ভ্রান্তির পুনরাবির্ভাব' হিসেবে উলে-খ করে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, আমরা পুরুষরা কেবল যে মানব প্রজাতির অর্ধেক অংশমাত্র এ ধারণা থেকে এটা আমাদের নিবৃত্ত করবে। কমিশনের চেয়ার ইলিয়নর রুজভেল্ট এই শব্দ ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে

বলেন, 'আমরা যখন বলি যে 'সকল মানুষ ভাই ভাই' তখন আমরা বোঝাতে চাই যে, সকল মানব ভাই ভাই এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে আমরা ব্যবধান রচনা করছি না।' এভাবে কিছুকালের জন্য সে ভাষা বহাল থেকে যায়। চূড়ান্ত খসড়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লিঙ্গা-পক্ষপাতমুক্ত শব্দ 'মানুষ', 'প্রত্যেকে' ও 'ব্যক্তি' ব্যবহার করা হয় এবং অবতরণিকায় 'নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের' কথা সুস্পষ্টভাবে উলে-খ করা হয়। বহুলাংশে এর কৃতিত্ব হলো কমিশনের দু'জন মহিলা সদস্য ভারতের হানসা মেহতা ও ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের মিনার্ভা বারনারডিনোর- যাদের প্রচেষ্টায় এটা হয়েছে।

তবে সর্বজনীন ঘোষণা এবং পরবর্তীকালে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তঃসরকারি সংস্থার গৃহীত মানবাধিকার দলিলগুলোতে পুংবাচক বিশেষ্য ও সর্বনামগুলো দিয়ে নারীও বোঝাবে বলে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য ও ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি (he) ও তার (his)-এর মতো কর্তৃবাচক ও সম্বন্ধবাচক সর্বনামের ব্যবহার অব্যাহত থাকে। সুস্পষ্ট ও বারংবার বর্ণিত বৈষম্যবিরোধী ধারাগুলোতে বৈশিষ্ট্য বা অবস্থা হিসেবে বৈষম্য বা মানবাধিকার অস্বীকার করার কারণরূপে লিঙ্গাকে ব্যবহার করা যাবে না বলে সুস্পষ্টভাবে উলে-খ থাকলেও মানবাধিকার যে সমভাবে উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের জারিকৃত দলিলগুলো ব্যর্থ হয়েছে, যেখানে উচ্চপদে কোনো নারী তাদের কেবল করণিক ও নিম্ন বেতনের পদে নিয়োজিত রেখে একটা পেশাগত বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা হয়। অবশ্য ১৯৭০-এর দশক থেকে বিভিন্ন আন্তঃসরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং সরকারি সংস্থা লিঙ্গাভিত্তিক বৈষম্য মোচনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

সিডো : নারী অধিকারের একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরের একটি প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণাদায়ক। ঐ প্রস্তাবে ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা করা হয়। দশক পালনকালে যেসব নিবিড় প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাতে ছিল জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিলের (ইউনিফেম) মতো বিশেষ সংস্থা ও নারীর অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গঠন, নারীর অগ্রগতি বিষয়ক শাখাকে একটা 'বিভাগ' হিসেবে উন্নীতকরণ এবং নারীর অধিকার ও উদ্বেগের বিষয়গুলো অন্যান্য সম্মেলন ও সংস্থার এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করা। যুক্তির দিক থেকে দশকে চলাকালে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ কনভেনশনের (সিডো) প্রস্তুতি, যা ১৯৭৯ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়।

সিডো হলো একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফসল, কিন্তু এটাকে বেগবান করা হয় ১৯৭৩ সালের নারীর মর্যাদা বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশনের (সিএসডব্লু)-মাধ্যমে। কমিশন তার কার্যপত্রে বলেছে যে, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ ঘোষণা (১৯৬৭) কিংবা আইনিভাবে বাধ্যতামূলক মানবাধিকার দলিল কোনোটাই নারীর মর্যাদা এগিয়ে নিতে কার্যকর ছিল না। এতে একটি একক ব্যাপক কনভেনশনের যুক্তি দিয়েও বলা হয় যে, তা দেশগুলোকে বৈষম্যমূলক আইন এবং কার্যত বৈষম্য বিলোপে আইনি বাঁধনে আবদ্ধ করবে। ছয় অংশে সন্নিবেশিত ৩০টি ধারা সংবলিত সিডো তার প্রথম ধারায় 'নারীর প্রতি বৈষম্যের' সংজ্ঞায় বলেছে : "বর্তমান কনভেনশনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে 'নারীর প্রতি বৈষম্য' বলতে লিঙ্গের ভিত্তিতে যে কোনো পার্থক্য, বর্জন বা বিধিনিষেধকে বোঝাতে যার পরিণতিতে বা উদ্দেশ্যে পুরুষ ও নারীর সমতা, মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক স্বাধীনতা একটি সমতার ভিত্তিতে বৈবাহিক মর্যাদা নির্বিশেষে নারীর স্বীকৃতি, ভোগ বা প্রয়োগ ব্যাহত বা অকার্যকর হবে।"

কনভেনশনের পরবর্তী ১৫টি ধারায় (ধারা ২ থেকে ১৬) বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আইন, আইনি কাঠামো, রাজনৈতিক ও জনজীবন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, গ্রামীণ পরিবেশ, বিয়ে ও পরিবার, এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পক্ষগুলোকে বৈষম্য নিরসনে ব্যবস্থা নিতে হবে। শেষ দুটি অংশে (ধারা ১৭ থেকে ৩০) কনভেনশন বাস্তবায়নের বিষয় বলা হয়েছে। 'বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিবেচনার জন্য' ধারা ১৭ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ কমিটি গঠন করেছে, যা পরিবীক্ষণ ও উপদেষ্টা সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। কমিটি রাষ্ট্রপক্ষগুলো কর্তৃক নির্ধারিত সময় পরপর পেশকৃত রিপোর্ট যাচাই, যে প্রতিনিধি দল রিপোর্ট পেশ করে তাদের কনভেনশনের উদ্দেশ্য পূরণে নির্দেশনাদান ও প্রশ্নাদি করে এবং কনভেনশনের অভিপ্রায় ও আওতার ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ সুপারিশ প্রদান করে।

কমিটির দেয়া সাধারণ সুপারিশমালা কনভেনশনের বিধানগুলো বিশদভাবে উপস্থাপন এবং কিছু লিঙ্গ-সংশি-ষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নারীর মূল্যের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব ও চর্চাগুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নারীর অসুবিধা ঘটায় ও তাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করে এমন লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, সমমূল্যের কাজের জন্য অসম পারিশ্রমিক, নারীর অবমূল্যায়িত ও পারিশ্রমিকবিহীন গৃহ কাজ, বহুবিবাহ ও অন্যান্য বৈবাহিক চর্চার মতো বিষয়গুলোতে গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে কমিটির সাধারণ সুপারিশগুলো সিডোর আওতা বিস্তৃত ও এটাকে একটি জীবন্ত দলিলে পরিণত করেছে। 'পুরুষের সঙ্গে সমভাবে' নারীর এক গুচ্ছ অধিকার ভোগ নিশ্চিত করার একটি ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রপক্ষগুলোর চাহিদা অনুসারে পুরুষকে বিবেচনা করা বা প্রধানত নারী এমন কিছু লঙ্ঘনের শিকার হয় যার সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ উলে-খে ব্যর্থতার বিষয়ে শব্দ ব্যবহারে কনভেনশনের কিছু সীমাবদ্ধতার নিরসন সিডো তার সাধারণ সুপারিশের মাধ্যমে ঘটাচ্ছে।

উচ্চহারে অনুমোদনের মধ্য দিয়ে সিডো জনপ্রিয়তা প্রতিফলিত যা উৎসাহব্যঞ্জক। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর গৃহীত হওয়ার প্রায় দু'বছর পর সিডো ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বলবৎ হয়েছে। মানবাধিকার হাইকমিশনারের দপ্তরের হিসাব অনুসারে ২০০৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতিসংঘের শতকরা ৯৬ ভাগ সদস্য, ১৮৫টি দেশ কনভেনশনের পক্ষ হয়েছে। অবশ্য যে ৭৮টি দেশের (শতকরা ৪২ ভাগ রাষ্ট্রপক্ষ) অনুমোদন, সংযোজন বা পরম্পরাভুক্তির বিষয় ঘোষণা হয়েছে বা অনীহা রয়েছে তা তাদের চুক্তির বাধ্যবাধকতা পালন সীমিত করার সুযোগ দিয়েছে। অন্য যে কোনো মানবাধিকার চুক্তির চেয়ে এই কনভেনশনের ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক দেশ তাদের অনীহা প্রকাশ করায় 'রাষ্ট্রপক্ষের কাছে সিডো এমন একটি মানবাধিকার দলিল যা সবচেয়ে কম শ্রদ্ধার বলে প্রতীয়মান হয়।' অনীহা পরে প্রত্যাহার করা হতে পারে; এ পর্যন্ত ১৪টি দেশ তাদের অনীহা প্রত্যাহার করেছে এবং অনুরূপসংখ্যক দেশ কোনো কোনো বিধানের ব্যাপারে অনীহা প্রত্যাহার বা সংশোধন করেছে। তবে, কনভেনশনের বিধানগুলো কোনো দেশের সংস্কৃতি বা ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে দাবি করে অনীহার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, নিকট ভবিষ্যতে তা প্রত্যাহারের সম্ভাবনা নেই। এ ধরনের ব্যাপক অনীহা চুক্তির 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে'

খর্ব করে এবং সব বাস্তব উদ্দেশ্যে তা অপ্রযোজ্য রেখে দেয়।

বিধানগুলোর প্রতি সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় আপত্তিকে দুটি পারস্পরিক সংশি-ষ্ট যুক্তি দিয়ে চ্যালেঞ্জ দেয়া যেতে পারে : প্রথমত উলে-খ করতে হবে যে, আঞ্চলিকসহ জাতিসংঘের মানবাধিকার দলিলগুলো অনিবার্যভাবেই পাল্টা-সংস্কৃতি এবং দ্বিতীয়ত, লক্ষ্যগুলোর মধ্যে উত্তেজনা থাকতে পারে (যেমন, সংস্কৃতি সংরক্ষণ বনাম বৈষম্যমূলক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি বিলোপ) কিংবা দুই বা ততোধিক মানবাধিকারের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে (যেমন মানুষের অধিকারে নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরোধিতা), এ ধরনের ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলো চায় যে, মর্যাদার সর্বজনীনতা ও সমতা সমুন্নত রেখে এগুলোর সমাধান করতে হবে।

পাল্টা-সংস্কৃতি হিসেবে মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার কোনো কোনো অধিকারের প্রতি অনেক সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অভিসম্বন্ধ ও ধর্মপুস্তকে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা ব্যক্ত করা হলেও ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও চর্চায়ও অসংখ্য বৈষম্যমূলক শর্তাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানুষ হওয়ার কারণেই *সকল* মানুষের কিছু অধিকার রয়েছে বলে এই ঘোষণা ও পরবর্তী মানবাধিকার দলিলগুলোতে যে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে তার অভিনবত্ব কেবল সর্বজনীনতাই নয় বরং তা সেই ইচ্ছেও যা সংস্কৃতিগুলোতে বিদ্যমান থাকতে দেয়া সব বৈষম্যের অবসান চায়। অন্য কথা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার একটা রীতি অনুসরণ করে লঙ্ঘনগুলো দেখা যায় বলে বিদ্যমান সংস্কৃতিতে যেসব অধিকার লঙ্ঘিত হয় সেগুলো রক্ষার জন্য ঘোষণা ও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে অনেক মনবাধিকার লঙ্ঘন ও বৈষম্য কেবল সাংস্কৃতিকভাবেই অনুমোদনযোগ্য নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক রীতিতে তাকে উৎসাহিত করা হয় বা সেটা সাংস্কৃতিক চাহিদা। সে কারণেই সিডো সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ঐতিহ্য ও প্রথাগুলোর উলে-খ করেছে এবং সংস্কৃতির বৈষম্যমূলক রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও চর্চাগুলো পরিবর্তনের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে–

- এতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'সমাজ ও পরিবারে পুরুষের *ঐতিহ্যগত ভূমিকা* ও নারীর ভূমিকা পরিবর্তন করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পূর্ণ সমতা অর্জন করা প্রয়োজন।'
- রাষ্ট্রপক্ষগুলো নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিদ্যমান আইন, বিধি, *প্রথা ও চর্চা* পরিবর্তন বা বিলোপ করার জন্য আইন প্রণয়নসহ, সব উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে... সম্মত হয়েছে' [ধারা ২ (চ)];
- রাষ্ট্রপক্ষগুলো নারীর সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে প্রয়োগ ও ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে নারীর পূর্ণ বিকাশ ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সব ক্ষেত্র, বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও *সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে*, আইন প্রণয়নসহ সব উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (ধারা ৩);
- রাষ্ট্রপক্ষগুলো ক. উভয় লিঙ্গের যে কারোরই হীনতা বা শ্রেষ্ঠতার ধারণা বা পুরুষ ও নারীর *গতানুগতিক ভূমিকার* ভিত্তিতে *সংস্কার এবং প্রথাগত বা অন্য সকল চর্চার* বিলোপ অর্জনের লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর *সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের* ধারা পরিবর্তনে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা ৫)।

প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারগুলোর মধ্যে উত্তেজনা

মানবাধিকার এবং বিশেষ করে নারীর অধিকারের সর্বজনীনতাকে অনেকক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক সম্পর্কবাদীরা চ্যালেঞ্জ করে। সম্পর্কবাদী যুক্তিগুলো যখন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সমাজের জন্য তা একটা বড় ধরনের উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি করে। মানুষের সংস্কৃতি ও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কীভাবে স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে যখন ঐসব সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক প্রণালিবদ্ধভাবে কিছুসংখ্যক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে? এই প্রশ্ন বিশেষ করে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সকল সমসাময়িক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক বলে সব দেশেই নারীর অধিকার এগিয়ে নেয়া অনিবার্যভাবেই পিতৃতান্ত্রিক 'সাংস্কৃতিক' মূল্যবোধ, ধর্মীয় রীতিনীতি ও আধিপত্য পরম্পরার অন্যান্য কাঠামোর সঙ্গে অনিবার্যভাবেই সাংঘর্ষিক হবে। তাই কঠোর সাংস্কৃতিক সম্পর্কবাদ অনুসরণ করা হলে নারীর অধিকারগুলো তা কার্যত সকল সমাজের 'পর' করে রাখবে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার

দলিলগুলোর অর্গলমুক্তির বিষয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের নামে খর্ব ও বিপন্ন হবে।

সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রসঙ্গে আমাদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন : জনগণ ও ধর্মের পক্ষে কারা কথা বলেন? কারা সংস্কৃতির অর্থের *সংজ্ঞা* দেন এবং ধর্মের উৎস *ব্যাখ্যা* করেন ও মতবাদ গড়ে তোলেন? সংস্কৃতি অবশ্য একশিলা স্তম্ভ বা নিশ্চল নয়, কিন্তু প্রতিটি সংস্কৃতিতে এমন লোক আছে যারা এটাকে একশিলা স্তম্ভ বানিয়ে বা নিশ্চল করে রেখে তা থেকে ফায়দা কামায়। অন্য কথায়, সংস্কৃতির ভিত্তি শক্তি কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং রীতিনীতি সংযোজন ও মূল্যবোধ আরোপ করে ঐসব কাঠামোকে তারা চিরস্থায়ীও করে তোলে। সাংস্কৃতিকভাবে (ও দাপ্তরিক) এগিয়ে নেয়া মূল্যবোধে সমাজের কিছু লোকের সুবিধা হয় ও কিছু লোকের অসুবিধা হয় আর সুবিধাপ্রাপ্তরা ঐসব মূল্যবোধ ধরে রেখে তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে চাইবে যা তাদের সুবিধাভোগের অবস্থান যুক্তিযুক্ত ও রক্ষা করবে। এভাবে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ন ছাড়াই সাংস্কৃতিক সম্পর্কবাদ ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ সুবিধাভোগী লোকদের রক্ষায় কেবল একটা কর্মে পরিণত হয়।

এই একই নিদর্শন ব্যবহার করে সব ধর্মগ্রন্থ ও মৌখিক ঐতিহ্য একটা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে গৃহীত হয় এবং বিদ্যমান সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মাধ্যমে পরিশ্রুত করা ও গলানো হয়। ব্যাখ্যার জন্য সদা উন্মুক্ত এসব ধর্মগ্রন্থ ও মৌখিক ঐতিহ্যের বার্তা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো দ্বারা ধ্বংস হতে বা তার গুরুত্ব হ্রাস পেতে পারে। ধর্মে এভাবে সাংঘর্ষিক রীতিনীতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা সুবিধাপ্রাপ্ত এবং যারা ধর্ম ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে– তারা উভয়েই নির্বাচিতভাবে তার ব্যবহারও ব্যাখ্যা করে। বলাবাহুল্য, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা হলো সুবিধাভোগী পুরুষদের কণ্ঠ যারা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিকে নির্দেশিত করে, এমনকি নারীর মাধ্যমেও যারা এগুলো পৌঁছানো ও স্থায়িত্বদানে সহায়তা নিতে পারে। নারীর সমতাবাদী

ও অর্গলমুক্তিমূলক ব্যাখ্যা ও তাদের সমর্থকদের অবহেলিত বা নিগৃহীত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কী করা প্রয়োজন?

সংস্কৃতির সঙ্গে মানবাধিকার নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং অধিকারের প্রসার, পূর্ণ স্বীকৃতি ও সুরক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক রীতিনীতিও তাদের উপকরণগুলোর ভিত্তির রূপান্তর প্রয়োজন। তাই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিপালনের জন্য সাংস্কৃতিক রীতিনীতিতে একটা পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রয়োজন হবে। মানবাধিকারের সপক্ষতায় যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা হলো : ১. মানবাধিকার নীতিমালার সঙ্গে সাংস্কৃতিক রীতিনীতি খাপ খাওয়ার বিষয় বিশে-ষণ করা; ২. সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসের ব্যাখ্যার বৈচিত্র্য স্বীকার করা এবং ৩. কনভেনশনের রাষ্ট্রপক্ষগুলোর কাছে তাদের অনীহা কখন ও কীভাবে অপসারণ করবে তা উলে-খ করে অনীহা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নেয়ার দাবি জানানো।

সর্বজনীন ঘোষণা ও অন্যান্য মানবাধিকার দলিলের বেশ কিছু অধিকার অধিকাংশ সমাজের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে বিদ্যমান ও সেগুলো মান্য করা হয় বলে উলে-খ করে সর্বজনীনতাবাদীরা সচরাচর সম্পর্কবাদীদের দাবির বিরুদ্ধে তাদের যুক্তি তুলে ধরে। এসব দৃঢ়োক্তি অভিজ্ঞতার আলোকে সমর্থন করা গেলেও, আগেই উলে-খ করা হয়েছে যে, ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, চর্চায় ও অসংখ্য বৈষম্যমূলক শর্ত রয়েছে। এভাবে সংস্কৃতির উভয় দিক (সমতাবাদী–অর্গলমুক্তি এবং বৈষম্যমূলক–নিপীড়নমূলক) স্বীকার করতে হবে এবং সকল সংস্কৃতি কোথায় ও কীভাবে সর্বজনীনতা পালন করে তা বিশে-ষণ করতে হবে। মানবাধিকার মানবের মর্যাদা বিষয়ক বলে সর্বজনীনতার নীতির অর্থ হলো সবার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং এ নীতির আহ্বান হলো সমআচরণের। সংস্কৃতিগুলো সমতার নীতির ক্ষেত্রে কোথায় সাংঘর্ষিক তা চিহ্নিত করার জন্য সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সংস্কৃতির 'সমতাবাদী' দিকটি পরিলক্ষিত হলেই তা গুরুত্বসহকারে তুলে ধরে নীতিমালা হিসেবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক সমালোচনামূলক মূল্যায়ন ও সাংস্কৃতিক উৎসের সমতাবাদী ব্যাখ্যা ইতোমধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে; কিন্তু এসব বিকল্প বক্তব্য দেশে দমিত ও আন্তর্জাতিক আলোচনায় অগ্রাহ্য হয়। দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যকে সংস্কৃতিকে লঙ্ঘনের আধার বলে অভিহিত করে, ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতিকে সমান করে এবং সংস্কৃতিকে একশিলা স্তম্ভ ও নিশ্চল বলে বিবেচনা করে ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধার নামে সাংস্কৃতিক বৈষম্য সয়ে যাওয়ার অভ্যাস

বেরিয়ে আসতে হবে। আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসম্প্রদায় সংঘাত ও আধিপত্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ থাকলেও সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যবধান ও আধিপত্য নিরসনের কোনো প্রচেষ্টা নেই। একটি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান রাষ্ট্রপক্ষাগুলো ও আন্তর্জাতিক ফোরামে স্বীকার করলে তা বিকল্প বক্তব্যে সমর্থন জোগাবে এবং ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়নে সহায়তা করবে।

চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে সম্পর্কবাদী যুক্তি ও অনীহাকে এই বলে মোকাবিলা করা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রীতিনীতির চাহিদা হলো এ ধরনের প্রথা ও ঐতিহ্যে একটা পরিবর্তন এবং ধর্মীয় চাহিদা বলে যা উপস্থাপন করা হয় তাতে ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে। রাষ্ট্রপক্ষগুলোর কাছে চাওয়া হলো যে, তারা এমন দাবি করবে যা তাদের অনীহাকে কেবল পুরোপুরি ব্যাখ্যা ও সুনির্দিষ্টই করবে না বরং শর্ত হিসেবে এমন একটা কর্মসূচি দেবে যা অনীহা বিদুরণের পথ সুগম করবে। সিডোর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ কমিটি এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। যেসব রাষ্ট্রপক্ষ সিডোর বিধানগুলো তাদের শরিয়া আইনের সঙ্গে যদি কেবল সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে তারা তা বাস্তবায়ন করবে বলে 'ধামাচাপামূলক অনীহা' প্রকাশ করেছে। তাদের অনীহার বিষয়গুলো স্পষ্টীকরণের জন্য চাপ দিয়ে কয়েকটি সুপারিশ পাঠিয়েছে। কমিটি ব্যাখ্যার বিষয়টি সমস্যার আবর্তেও জড়িয়ে ফেলেছে,... সিডো কমিটি তার ১৯৮৭ সালের বৈঠকে ইসলামি আইন ও প্রথায় নারীর মর্যাদা এবং বিশেষ করে বিয়ে, তালাক, হেফাজত ও সম্পত্তির অধিকার এবং সমাজের জনজীবনে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে ইসলামের আল ইজতিহাদের (ব্যাখ্যা) নীতিকে বিবেচনায় রেখে সমীক্ষা এগিয়ে নেয়া ও সমীক্ষা চালানোর জন্য জাতিসংঘ ও তার বিশেষ সংস্থাগুলোকে অনুরোধ জানিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এ সিদ্ধান্তের প্রভাব যেসব রাষ্ট্রপক্ষের ওপর পড়ে তারা এটাকে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি হুমকি হিসেবে অভিহিত করে বিরুদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করে এবং কমিটির সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু কমিটি বিষয়টি নিয়ে চাপ দেয়া অব্যাহত রেখেছে। যেসব রাষ্ট্রপক্ষ পর্যাপ্ত সংস্কৃতি ও ধর্মভিত্তিক কারণে অনীহা তুলে ধরেছে কমিটি ১৯৯৪ সালে তাদের জন্য অতিরিক্ত ও নির্দিষ্ট নির্দেশনাদানের জন্য রিপোর্ট তৈরির নির্দেশিকা সংশোধন করে। জেনি কনরস একটি সার-সংক্ষেপ দিয়েছেন : এ ধরনের দেশগুলোকে তাদের অনীহা সম্পর্কে এই বলে সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট দিতে হবে যে, অনীহাকে কেন তারা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছে এবং তাদের জাতীয় আইন ও নীতিতে তার সুস্পষ্ট প্রভাব কী এবং অনুরূপ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধায়ক অন্যান্য মানবাধিকার চুক্তির ক্ষেত্রেও তারা অনুরূপ অনীহার আশ্রয় নিয়েছে কিনা। এসব রাষ্ট্রকে আরো জানাতে হবে যে, অনীহার কার্যকারিতা সীমিত বা তা প্রত্যাহার করার কোনো পরিকল্পনা তাদের আছে কিনা, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, অনীহা প্রত্যাহারের একটা সময়সূচিও তাদের জানাতে হবে। কমিটি (কয়েকটি দেশের উলে-খ করে) আভাস দেয় যে, কমিটি এ ধরনের অনীহাকে কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে করে এবং যেসব দেশকে তাদের অনীহার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা সম্পর্কে রিপোর্টদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

কমিটিকে তার নিরন্তর প্রয়াসে ছায়া রিপোর্টদানেও উৎসাহিত করতে হবে, যাতে রিপোর্টদানকারী দেশ কনভেনশন বাস্তবায়নে কী করেছে বা করেনি কেবল তার মূল্যায়ন নয়, বরং তাদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় উৎসের বিকল্প ব্যাখ্যাও তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এধরনের রিপোর্ট চাওয়ার ফলে কমিটি অনীহার যৌক্তিকতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে কার্যকরভাবে প্রশ্ন করার তথ্য পাবে এবং তাদের সমাজে বিদ্যমান বিভিন্নতাকে স্বীকার করে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটা নারী ও নারী অধিকারের প্রবক্তাদের তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎস ব্যাখ্যা করার অধিকারকে বৈধতাদানের মাধ্যমে সহায়তা করবে।

লেখিকা
জহরা এফ কাবাসাকাল আরাত
নিউইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পারচেজ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জুয়ানিটা ও জোসেফ লেফ প্রফেসর এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির মানবাধিকার গবেষণা কমিটির চেয়ার।

আত্মসংবৃত (অটিস্টিক) লোকদের পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সাহায্য করার জন্য **বান কি-মুনের** বৃহত্তর প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান

মহাসচিব বান কি-মুন বিশ্বের আত্মসংবৃতি আক্রান্ত প্রায় ৬ কোটি ৭০ লাখ লোক যাতে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানো ও সমাজে অবদান রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ থেকে উপকৃত হতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্ব আত্মসংবৃতি সচেতনতা দিবস (বিশ্ব অডিজম দিবস) উপলক্ষে ২ এপ্রিল এক বার্তায় মি. বান উলে-খ করেন, ক্রমবর্ধমান আন্ত র্জাতিক সম্মিলিত কণ্ঠ আত্মসংবৃতি আক্রান্ত শিশু ও লোকদের পরিপূর্ণ ও অর্থবহ জীবনযাপনে সমর্থ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

তিনি বলেন, এটা একটি বাস্তবতা যা আত্মসংবৃতি সম্পর্কে অনুকূল উপলব্ধি এগিয়ে নেয়া এবং এই ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি বৃহত্তর সামাজিক অনুধাবনের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব-ুএইচও) বক্তব্য অনুসারে সংবৃতি বিস্তৃতি-জনিত ব্যাধি হলো যোগাযোগ দক্ষতা ও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ায় বিভিন্ন মাত্রার বৈকল্য এবং সীমিত, পৌনঃপুনিক ধরনের আচরণ। এই ব্যাধি যে পিছিয়ে পড়ার অবস্থা সৃষ্টি করে তা সারাজীবনের জন্য স্থানীয় হতে পারে। প্রাপ্ত প্রমাণে মনে হয় যে, শুরুতেই উদ্যোগ নেয়া হলে উন্নত ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের সংবৃতি বিস্তৃতিজনিত ব্যাধি ও অন্যান্য মানসিক বৈকল্য বিষয়ক প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দান, তা বাস্তবায়ন ও তাতে অর্থায়নের প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছে, এসব শিশুর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বর্তমানে কোনো চিকিৎসা বা সেবা পাচ্ছে না।

সংস্থা উলে-খ করেছে, এসব দেশের আশু চ্যালেঞ্জ হলো শিশুদের মানসিক বৈকল্য শুরুতেই নির্ণয় ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা।

ডব-ুএইচওর মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকের অপব্যবহার বিষয়ক পরিচালক ডা. বেনেডেটো সারাসেনোস বলেছেন, 'শিশুদের আত্মসংবৃতি ও অন্যান্য মানসিক ব্যাধি বিষয়ক একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক এজেন্ডাকে ব্যয়সাশ্রয়ী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

কৌশলের প্রামাণ্য ভিত্তি সৃষ্টি ও জোরদার করতে হবে।'

'প্রকৃত প্রয়োজন হলো পরিসেবা বিন্যাস। এটা শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জনের উন্নতি ঘটাবে এবং একটি উন্নততর পরিজ্ঞাত ও সুস্থ শিশু প্রজন্ম সৃজনে অবদান রাখবে।' ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ পরিষদ আত্মসংবৃতি ব্যাধি সম্পর্কে অধিকতর অনুধাবন এগিয়ে নেয়ার মানসে বিশ্ব প্রচেষ্টা জোরদারের জন্য ২ এপ্রিল বিশ্ব আত্মসংবৃতি সচেতনতা দিবস হিসেবে মনোনীত করে।

এ বছর জাতিসংঘ পরিবার ও এর সহযোগীরা বক্তৃতা, ব্রিফিং, চিত্র প্রদর্শন, সঙ্গীতানুষ্ঠান, ভিডিও কনফারেন্স, শিল্পকলা স্থাপন ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করে।

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বিশ্ব অটিজম দিবস পালন

২ এপ্রিল ২০০১

বিশ্ব অটিজম দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এক আলোচনা অনুষ্ঠান ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বাংলাদেশস্থ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক সুলতানা জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা বিশেষ হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রতিবন্ধী শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অটিস্টিক এবং অবহেলিত শিশুদের আঁকা ২২০টি ছবি নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোকে পুরস্কৃত করা হয়।

অধ্যাপক সুলতানা জামাল ও কাজী আলী রেজাসহ অতিথিবৃন্দ চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন

বিশ্ব অটিজম দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

৭ এপ্রিল ২০০১

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ভিএসও এবং জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের সহযোগিতায় ইউএনভি/ইউএনডিপি গত ৭ এপ্রিল স্বেচ্ছাসেবা ও এমডিজি বিষয়ক এক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আহাদ আলী সরকার ও সভাপতিত্ব করেন একই মন্ত্রণালয়ের সচিব এহসান উল ফাত্তাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউএনডিপি কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন প্রিজনার, দৈনিক প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ক্যাম্পেইনের আঞ্চলিক প্রধান মিনার পিম্পল ও যুব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফখরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ভিএসিও কান্ট্রি ডিরেক্টর শাহানা হায়াত, ইউএনভি কোঅর্ডিনেটর ওজি ওটি এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা

মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

প্রথম আলোর সম্পাদক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org